মাওবাদ, স্তালিনবাদ বনাম বিপ্লবী মার্ক্সবাদ

সি পি আই (মাওবাদী) দল লালগড় আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গে নিজেদের প্রভাব ও তৎ-পরতা বৃদ্ধির যে চেষ্টা চালাচ্ছে, তার ফলে কেবল সিপিআই(এম) দল বা বিভিন্ন বুর্জোয়া দলের সঙ্গেই তাদের বিতর্ক বেঁধেছে, এমন নয়—নকশালবাড়ির পথের অনুসরণকারী বলে যাঁরা নিজেদের দাবি করেন, তাঁদের অনেকের সঙ্গেই বিতর্ক বেঁধেছে, এমনকি তাঁদের অনেককে কম-বেশি হুমকিও দেওয়া হয়েছে। এই বিতর্কে অংশগ্রহণকারী সকলেই নিজেদের মার্ক্সবাদী বলে দাবি করেন। তাই তাঁদের বক্তব্যকে মার্ক্স-এঙ্গেলসের দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে যাচাই করে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

একটি প্রব- সব রকম বিষয় আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই বর্তমান প্রব-কে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, কিন্তু ধারাবাহিক রচনার প্রথম পর্ব হিসেবে দেখা ভাল। এই আলোচনাতে আমরা সামনে রাখব গণতন্ত্রের কেন্দ্রীয় স্থান সম্পর্কে বিতর্ক।

যাঁরা নিজেদের মার্ক্সবাদী বলে দাবি করেন, তাঁরা মার্ক্স-এঙ্গেলসের বক্তব্যের ধারাবাহিকতায় নিজেদের রাখেন কিনা, এটা অবশ্যই সর্বাগ্রে দেখা জরুরি। কার মার্ক্সবাদ শ্রেয়, এই বিতর্ক শুরু করতে গেলে প্রথম জানা দরকার, তাঁদের চিন্তায় মার্ক্স আছেন, না মার্ক্স বাদ। আমরা পাঠকদের কাছে তুলে ধরতে চাই যে বাস্তব সত্য, (এবং যেহেতু এই প্রব- কোনো গোয়েন্দা উপন্যাস নয়, তাই সত্যটা প্রথমেই স্পষ্ট করে বলা জরুরী) তা হল, মার্ক্স-এঙ্গেলসের দৃষ্টিকোণ থেকে এই সব বিপ্লবীরা হলেন "বিপ্লবের আলকেমিস্ট"(অর্থাৎ হাতুড়ে বিপ্লবী)।

শ্রমিক শ্রেণীর স্বমুক্তি

১৮৬৪ সালের ৪ঠা নভেম্বর মার্ক্স এঙ্গেলসকে একটি দীর্ঘ চিঠি লেখেন। এই চিঠিতে তিনি তাঁর সহকর্মী ও ব-ুকে জানান, ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৮৬৪, লন্ডনের সেন্ট মার্টিনস হলে শ্রমিকদের একটি সভা আহুত হয়। ব্রিটিশ, ফরাসী, ইতালীয় ও জার্মানদের উপস্থিতিতে এই সভা থেকে একটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিভিন্ন আলোচনার পর মার্ক্স দুটি দলিল রচনা করেন। জনৈক মেজর উলফ রচিত নিয়মাবলী (মার্ক্সের ভাষায়, ইউরোপীয় শ্রমিক শ্রেণীদের একরকম কেন্দ্রীয় সরকার) পাল্টে মার্ক্সের প্রস্তাবিত নিয়মাবলী ও তার মুখব- গৃহীত হয়, এবং মার্ক্স একটি স্বতন্ত্র প্রব- লেখেন, যা হল "Inaugural Address of the Working Men's International Association" (আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘের প্রাথমিক অভিভাষণ)। চিঠিতে মার্ক্স লেখেন, "লেখাটা এমন ভাষায় রাখা খুব কঠিন ছিল, যাতে আমাদের মতামত শ্রমিক আন্দোলনের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গী থেকে গ্রহণযোগ্য হবে। সপ্তাহ দুইয়ের মধ্যে, এই লোকেরাই ভোটাধিকার নিয়ে ব্রাইট আর কবডেনের সঙ্গে সভায় বসবে। আন্দোলনের পুনর্জাগরণের ফলে পুরোনো বলিষ্ঠ ভাষা ব্যবহার করতে এখনো সময় লাগবে। আমাদের হতে হবে কাজে দৃঢ়, কিন্তু আচরণে নম্র।" (মার্ক্স-এঙ্গেলস, কালেক্টেড ওয়ার্কস, খণ্ড ৪২, মস্কো ১৯৮৭, পৃঃ ১৮)। স্পষ্টতই, মার্ক্সের এই ব্যক্তিগত চিঠি দেখিয়ে দেয় যে উক্ত দলিল দুটি একটি সংগঠনের নামে প্রকাশিত হলেও, এ দুটিকে যে রাজনৈতিক মত ব্যক্ত হয়েছিল, তার মর্মবস্তু ছিল মার্ক্স ও এঙ্গেলসের রাজনীতি, কোনো রকম ট্রেড ইউনিয়নবাদী, নৈরাজ্যবাদী বা গোপন সংগঠন সর্বস্ব রাজনীতির সঙ্গে তাঁদের রফা নয়।

নিয়মাবলীর মুখব-, কেন আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়:

"That the emancipation of the working classes must be conquered by the working classes themselves; that the struggle for the emancipation of the working classes means not a struggle for class privileges and monopolies, but for equal rights and duties, and the abolition of all class-rule;"

(শ্রমিক শ্রেণীদের মুক্তি জিতে নিতে হবে শ্রমিক শ্রেণীদের নিজেদেরই; শ্রমিক শ্রেণীদের মুক্তির সংগ্রাম শ্রেণীগত বিশেষ সুবিধা এবং একচেটিয়া অধিকারের জন্য সংগ্রাম নয়, বরং সমান অধিকার ও কতর্ব্যের জন্য সংগ্রাম, এবং শ্রেণী শাসন অবসানের জন্য সংগ্রাম)

"That the emancipation of labour is neither a local nor a national, but a social problem, embracing all countries in which modern society exists, and depending for its solution on the concurrence, practical and theoretical, of the most advanced countries."

(শ্রমের মুক্তি, না স্থানীয় না জাতীয় সমস্যা। বরং তা এক সামাজিক সমস্যা, যা ব্যাপ্ত আছে সেই সব দেশে, যেখানে আধুনিক সমাজ বিদ্যমান, এবং যা সমাধানের জন্য নির্ভর করে সবচেয়ে অগ্রসর দেশগুলির বাস্তব ও তত্ত্বগত ঐক্যের উপর)। (মার্ক্স-এঙ্গেলস, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, মস্কো ১৯৭৭, খন্ড ২, পৃঃ ১৯)

অর্থাৎ, মার্ক্স এখানে জানাচ্ছেন যে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি আনবে স্বয়ং শ্রমিক শ্রেণী, সমতার জন্য এবং সব রকম শ্রেণী শাসনের অবসানের জন্য লড়াই করে। তিনি আরো বলছেন যে মজুরি দাসত্বের অবসান এমন একটি সামাজিক প্রসঙ্গ, যার সমাধানের জন্য চাই সমস্ত অগ্রসর দেশের ঐক্য। অগ্রসর দেশের সংজ্ঞা হল, যে সব দেশে "আধুনিক সমাজ" (অর্থাৎ পুঁজিবাদী সমাজ) রয়েছে।

এই বক্তব্যের এক গভীর তাৎপর্য রয়েছে। কিন্তু তাৎপর্য আলোচনার আগে আমরা দেখব, এই মত বাস্তবে মার্ক্সের বা মার্ক্স-এঙ্গেলসেরই মত, এমন কোনো মত নয় যা সাময়িক জোট গঠনের খাতিরে তাঁরা লিখেছিলেন। ১৮৭৯ সালে, আন্তর্জাতিকের বিলুপ্তির বেশ কয়েক বছর পরে জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক দলে একটি বিতর্ক প্রসঙ্গে বেবেল, ভিলহেলম লিয়েবক্লেশট, ব্র্যাকে ও অন্যান্যদের উদ্দেশ্যে মার্ক্স-এঙ্গেলস একটি চিঠি লেখেন। জার্মানীকে তখন বিসমার্কের আইনে পার্টি নিষিদ্ধ। সুইজারল্যান্ড থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় পার্টির তিন সদস্যের নামে একটি প্রব- বেরোয়। এই প্রব- বলা হয়, লাসাল যে আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলন মনে করে শুধু শ্রমিকদের নয়, বরং সব সৎ গণতন্ত্রীকে আহ্বান করেছিলেন, এবং যে আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকার কথা ছিল বিজ্ঞানের স্বাধীন প্রতিনিধিদের এবং মানবতার প্রতি খাঁটি প্রেম রয়েছে এমন সব মানুষের, তা পরে পর্যবসিত হয়েছিল শিল্প শ্রমিকদের স্বার্থে একপেশে লড়াইয়ে। দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে মার্ক্স ও এঙ্গেলস এই প্রব- সম্পর্কে তাঁদের নিজেদের মত প্রকাশ করেন, "সংক্ষেপে বলতে গেলে, শ্রমিক শ্রেণী নিজের মুক্তি আনতে অপরাগ। এজন্য তাকে 'শিক্ষিত ও বিত্তবান' বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে রাখতে হবে।"

মার্ক্স ও এঙ্গেলস এই বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, এ কথা পেটি বুর্জোয়াদের মতাদর্শ। দীর্ঘ (প্রব--সম) চিঠির শেষে তাঁরা লেখেন:

"আর আমাদের নিজেদের প্রসঙ্গে বলতে হয়, আমাদের সমগ্র অতীতের আলোকে আমাদের সামনে একটাই রাস্তা খোলা আছে। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে আমরা ইতিহাসের তাৎক্ষণিক চালিকা শক্তি হিসেবে জোর দিয়েছি শ্রেণী সংগ্রামের, বিশেষত আধুনিক সমাজ-বিপ্লবের শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে বুর্জোয়া শ্রেণী ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে শ্রেণী সংগ্রামের উপর।... যখন আন্তর্জাতিক গঠিত হয়েছিল তখন আমরা সুনির্দিষ্টভাবে যে রণধ্বনি সৃষ্টি করি, তা হল, 'শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তিকে হতে হবে শ্রমিক শ্রেণীর নিজের কাজ'। তাই আমরা সেই সব লোকের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারি না, যারা খোলাখুলি বলে যে শ্রমিকরা এত বেশী অশিক্ষিত যে তারা নিজেদের মুক্ত করতে পারে না, এবং প্রথমে তাদের উপর থেকে মুক্তি দেবে দানবীর বড় বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়ারা।" (মার্ক্স-এঙ্গেলস, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, মস্কো ১৯৮৩, খন্ড ৩, পৃঃ ৯৩-৯৪)।

অতএব, ১৮৭৯ সালেও মার্ক্স ও এঙ্গেলসের দৃঢ় মত—শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি আনবে শ্রমিক শ্রেণী নিজেই।

শ্রমিক শ্রেণীর স্বমুক্তি ও প্রলেতারীয় গণতন্ত্র

কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি তারা নিজেরাই আনবে, এই মতের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে প্রলেতারীয় গণতন্ত্রের প্রসঙ্গ।

বিংশ শতাব্দীতে "মার্ক্সবাদ"-এর নামাবলী গায়ে জড়িয়ে প্রধানত দুরকম মত ঘোরাফেরা করেছে। এক দিকে, বুর্জোয়া গণতন্ত্র এবং প্রলেতারিয় গণতন্ত্রের মধ্যে প্রভেদকে কমবেশি অস্বীকার করে, শ্রেণী চরিত্রহীন এক "গণতন্ত্রের" কথা বলা হয়েছে। অন্য দিকে, গণতন্ত্র কথাটির অর্থ পাল্টে দিয়ে, শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণীগত অধিকারকে অস্বীকার করে "নেতৃস্থানীয়" দলের হুকুমশাহী জারি করতে চাওয়া হয়েছে। এই মতগুলির সঙ্গে মার্ক্স-এঙ্গেলসের ঠিক কী সম্পর্ক ছিল?

মার্ক্সের রাজনৈতিক বিবর্তনের সূচনা একজন গণতন্ত্রী হিসেবে। উনবিংশ শতাব্দীর সাম্যবাদী চিন্তার ইতিহাসে এটা সাধারণ ছিল না। অধিকাংশ সাম্যবাদী তাত্ত্বিক, যথা ফ্রান্সে শার্ল ফুরিয়ে, ব্রিটেনে রবার্ট আওয়েন, প্রমুখ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না। তার কারণটা ছিল সহজ। তাঁরা প্রত্যেকে মনে করতেন, তিনিই আদর্শ সমাজে পৌঁছবার ছবিটা পেয়ে গেছেন। এখন কাজ শুধু গোটা সমাজের উপর ঐ নকশাটা চাপিয়ে দেওয়া। আওয়েন তো স্পষ্ট লিখেছিলেন, পাগলাগারদে যেমন পাগলদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা উচিত, কিন্তু পাগলদের গণতান্ত্রিক মতের ভিত্তিতে পাগলাগারদ চালানো যায় না, তেমনি, অশিক্ষিত শ্রমিকদের মতের ভিত্তিতে সমাজ পাল্টানো যায় না। মার্ক্স ও এঙ্গেলস কোনো পূর্বনির্ধারিত ছক অনুযায়ী বিপ্লবের অগ্রগতির কথা ভাবেননি।

কমিউনিস্ট হওয়ার পর মার্ক্স তাঁর গণতান্ত্রিকতা বিসর্জন দেননি। ১৮৪৬ সালে, শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাস করেন না এমন কিছু "খাঁটি সমাজতন্ত্রী"দের সঙ্গে বিতর্ক চালাতে গিয়ে এঙ্গেলস কমিউনিস্টদের উদ্দেশ্য ঘোষণা করেন নিম্নলিখিত ভাষায় :

"১. বুর্জোয়া শ্রেণীর বিপরীতে প্রলেতারিয়েতের স্বার্থ যাতে জয়ী হয় তা নিশ্চিত করা; ২. এ কাজ করার জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান ঘোচানো এবং তাকে বদলে সম্পদের উপর সামাজিক মালিকানা কায়েম করা; ৩. এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বলপূর্বক গণতান্ত্রিক বিপ্লব ছাড়া অন্য কোনো পন্থা স্বীকার না করা।" (মার্ক্স-এঙ্গেলস, কালেক্টেড ওয়ার্কস, খন্ড ৩৮, পৃঃ ৮২)।

অর্থাৎ, শ্রেণী সংগ্রামের কেন্দ্রীয় ভূমিকা স্বীকার করলে দুটি পথ ত্যাগ করতে হয়—গণতন্ত্রহীন বলপ্রয়োগ এবং শ্রেণী

সংগ্রামকে এড়িয়ে গিয়ে সমাজ বদলের চেষ্টা। আজকের ভারতের রাজনৈতিক পরিভাষায় বলা যায়, দীপেশ চক্রবর্তী আদি উত্তরাধুনিক "নিম্নবর্গ" তাত্ত্বিকদের কল্পিত গা-ীবাদ, এবং মাওবাদীদের রণনীতি, দুটোকেই মার্ক্স ও এঙ্গোলস বর্জন করেছিলেন।

কমিউনিস্ট ইস্তাহারে মার্ক্স ও এঙ্গোলস বলেন, প্রলেতারিয় আন্দোলন হল ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠের সচেতন, স্বাধীন আন্দোলন। এখানে তাঁরা শ্রমিকদের সংখ্যাগত প্রাধান্যের কথা বলেননি, কারণ তাঁরা লিখেছিলেন, "জামার্নীতে বুর্জোয়া বিপ্লব হবে তার পরেই আসন্ন এক প্রলেতারীয় বিপ্লবের পূর্বক্ষণ।" স্পষ্টত, এখানে জোরটা ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর নীচে সমাজের সব স্তরের মানুষের উপর শ্রমিক শ্রেণীর মতাদর্শগত রাজনৈতিক আধিপত্যের উপর। এই কথ াই বলা হয়, একই পুস্তিকায়, আরেকভাবে "প্রলেতারিয়েতকে সবার আগে রাজনৈতিক প্রাধান্য অর্জন করতে হবে, জাতির নেতৃস্থানীয় শ্রেণী হয়ে উঠতে হবে।" (মার্ক্স-এঙ্গোলস, কালেক্টেড ওয়ার্কস, খন্ড ৬, পৃঃ ৪৯৫, ৫১৯ ও ৫০২-৩)।

পূর্ণ গণতন্ত্র ছাড়া ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠের সচেতন আন্দোলন হওয়া অসম্ভব। পূর্ণ গণতন্ত্র বলতে তাঁরা কি বুঝতেন, সেটা জানা তাই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, সর্বজনীন ভোটাধিকারের জন্য সংগ্রামকে তাঁরা একটি মৌলিক সংগ্রাম বলে মনে করতেন। ১৮৮০-র দশকে ফ্রান্সে তৃতীয় সাধারণতন্ত্রের দুর্নীতি ও তার প্রতি শ্রমজীবি মানুষের আক্রোশের সুযোগ নিয়ে জেনারেল বুলাঁজের নামে এক স্বার্থস-ানী সেনানায়ক পুঁজিবাদ-বিরোধী গরম বুলি ব্যবহার করে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেন। ফ্রান্সের সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে দুটি প্রবণতা দেখা দেয়। এক দল বুর্জোয়া উদারপন্থীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বুলাঁজেরের বিরোধিতা করেন। অন্য পক্ষ বুলাঁজেরের সঙ্গে হাত মেলাতে চান, বুর্জোয়া সংসদীয় রাজনীতির প্রতি তাঁদের ঘৃণাবশত। এই পক্ষে ছিলেন পল লাফার্গ, মার্ক্সের জামাই ও ফ্রান্সের "মার্ক্সবাদী"দের অন্যতম নেতা। লাফার্গকে একের পর এক চিঠিতে এঙ্গোলস বলেন, বুলাঁজেরের সমর্থক শ্রমজীবিদের মধ্যে যে বুর্জোয়া উদারনীতির প্রতি ঘৃণা রয়েছে, তা ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু তা থেকে তাঁরা যে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার বর্জন করতে রাজি, এটা তাঁদের অপরিণত মনস্কতার প্রমাণ দেয়। এঙ্গোলস বলেন, কাজটা বুর্জোয়া শ্রেণীকে রক্ষা করা নয়, গণতন্ত্র রক্ষার জন্য স্বাধীন প্রলেতারীয় লড়াইয়ের পথে সমাজতন্ত্রের দিকে এগোনো। তিনি আরো বলেন যে, বুলাঁজের ফ্রান্সের একনায়ক হলে সব গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হবে ও সেক্ষেত্র প্রধান ক্ষতি হবে শ্রমিক আন্দোলনের। (এঙ্গোলস—লাফার্গ করেসপন্ডেস, খন্ড ২, পৃ: ৩৪০, ১৩১, ১৬৫, ২৩৮)।

অন্য দিকে, মার্ক্স ও এঙ্গোলস মনে করতেন, ভোটের অধিকার যথেষ্ট নয়। "ফ্রান্সে শ্রেণী সংগ্রাম" বইয়ে মার্ক্স বলেন, বুর্জোয়া শ্রেণী অনেক ক্ষেত্র সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমেও নিজেদের শাসন বজায় রাখতে পারে। বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও শ্রমিক শ্রেণীর গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য একাধিক। প্রথম পার্থক্য অবশ্যই রাজনৈতিক ক্ষমতা কোন শ্রেণীর হাতে। কিন্তু তার সঙ্গেই যুক্ত, তাদের উদ্দেশ্য। শ্রমিক শ্রেণী নিজের শ্রেণী শাসন স্থায়ী করার জন্য রাষ্ট্র দখল করে নতুন রাষ্ট্র তৈরী করবে না। বরং, তাঁদের লড়াইয়ের উদ্দেশ্য সবরকম শ্রেণী শাসন ও তার অর্থনৈতিক ভিত্তির অবসান ঘটানো। ১৮৬৫তে, তাঁর জার্মান ব-ু কুগেলমানকে লেখা একটি চিঠিতে মার্ক্স বলেন, পূর্ণ গণতন্ত্র প্রাশিয়ার আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

অর্থাৎ, বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে অস্বীকার করে নয়, কিন্তু তাকে বহুগুণ সম্প্রসারিত করেই সৃষ্টি করতে হবে শ্রমিক শ্রেণীর গণতন্ত্রকে, এই ছিল তাঁদের মত। তাঁরা যে গণতন্ত্র চেয়েছিলেন এবং পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা যতদূর যেতে রাজি ছিলেন, তার মধ্যে পার্থক্য বিভিন্ন সময়ে দেখা দেয়। ১৮৪৮-এর বিপ্লবে, ফ্রান্সে যখন শ্রমিকরা ব্যারিকেডের লড়াই লড়েন, তখন জার্মানি থেকে সে লড়াইকে স্বাগত জানায় নয়ে রাইনিশে জাইটুং পত্রিকা, যার সম্পাদক ছিলেন মার্ক্স। বামপন্থী বুর্জোয়া পত্রিকা বনার জাইটুং লেখে, "আমরা স্বাধীনতা চাই, কিন্তু আমরা শৃংখলাও চাই। তা ছাড়া কোনো স্বাধীনতা টিকতে পারে না।" গণতন্ত্র চাই—কিন্তু মেপে। গণতন্ত্র চাই—কিন্তু সঙ্গে চাই ইউ.এ.পি.এ.—মাপ করবেন, শৃংখলা।

গণতন্ত্র চাই বলে মার্ক্স সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করেন। ১৮৪৮-এর ফরাসী সংবিধানকে তিনি তীব্র সমালোচনা করেন, কারণ মুখে সর্বজনীন ভোটাধিকারের কথা বলার পর দুটি আইনের মাধ্যমে ব্যাপক মানুষের, বিশেষত শ্রমজীবিদের, ভোট কেড়ে নেওয়া হয়। আরো উল্লেখযোগ্য হল আদালতের স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁদের মত। প্রাশিয়ার, এবং শ্লেষউইগ ও হলস্টাইনের খসড়া সংবিধান আলোচনা করে মার্ক্স লেখেন, এই সংবিধানগুলির অন্যতম উল্লেখযোগ্য ধারা হল, প্রশাসনিক ডিক্রিকে নাকচ করার যে অধিকার ঐতিহাসিকভাবে আদালতদের ছিল, তা রদ করা হয়েছে। অর্থাৎ বিচারবিভাগীয় স্বাধীনতাকে তিনি ভাঁওতা বলে মনে করেননি। অবশ্যই, আইন কোন শ্রেণী প্রণয়ন করবে, তা মৌলিক প্রশ্ন। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর গণতন্ত্রে বিচারবিভাগীয় স্বাধীনতা থাকবে না, এমন কোনো ইঙ্গিত তিনি দেননি।

১৮৭৫ সালে, গোথা কর্মসূচির সমালোচনা করতে গিয়ে মার্ক্স ও এঙ্গোলস দুজনেই লেখেন, ঐ কর্মসূচির গণতান্ত্রিক দাবিগুলি এত জোলো যে উদারপন্থীদের পক্ষে তা মেনে নিতে অসুবিধা হবে না। অর্থাৎ তাঁরা গণতন্ত্র খারিজ করতে

চাননি, অনেক সম্প্রসারণ করতে চেয়েছিলেন।

১৮৯১ সালে, জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক দল যখন অনেক স্পষ্টভাবে 'মার্ক্সবাদী' ভাষায় একটি কর্মসূচী গ্রহণ করে, তখনও তার সমালোচনা করে এঙ্গেলস লেখেন "যদি কোনো কিছু নিশ্চিত হয়, তবে তা হল, আমাদের দল ও শ্রমিক শ্রেণী ক্ষমতায় আসতে পারে কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের মধ্যে। এটা এমনকি শ্রমিক শ্রেণীর ডিক্টেটরশিপের নির্দিষ্ট রূপ, যা ইতিমধ্যেই দেখিয়েছে মহান ফরাসী বিপ্লব।" (মার্ক্স-এঙ্গেলস, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, খন্ড ৩, পৃ: ৪৩৫)। (মহান ফরাসী বিপ্লব বলতে এঙ্গেলস কী বলতে চেয়েছেন তা বিতর্কিত। ড্যানিয়েল গেয়্যাঁর মতে তিনি ১৭৯২-৯৪-এ প্যারিসের সাঁ কুলোৎ জনতা যে নিজস্ব গণতান্ত্রিক সংগঠন গড়েছিলেন তার উল্লেখ করছেন। হ্যাল ড্রেপার ও সোমা মারিক মনে করেন, এঙ্গেলস এখানে ১৮৭১-এর কমিউনের উল্লেখ করেছিলেন)।

সুতরাং গণতন্ত্রের ব্যাপকতম সম্প্রসারণ ছাড়া শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি সম্ভব নয়। সাংগঠনিক ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। তাই বিপ্লবী দলের ভূমিকা সম্পর্কেও তাঁদের স্পষ্ট কিছু ধারণা ছিল।

জার্মানীতে ১৮৪৮-এর বিপ্লবের পরাজয়ের পর ১৮৬০-এর দশকে নতুন করে শ্রমিক সংগঠন গড়ে ওঠে ফার্দিনান্দ লাসালের নেতৃত্বে । কিন্তু এই সংগঠনে ছিল নেতৃপূজার প্রথা। ১৮৬৩ সালে মার্ক্স এ বিষয়ে এঙ্গেলসকে লেখেন, লাসাল "শ্রমিকদের ডিক্টেটর" হিসেবে ব্যবহার করছেন। এঙ্গেলস তাঁর উত্তরে লেখেন, শ্রমিকদের অনগ্রসরতার উপর ভরসা করে আধুনিক বিপ্লবী দল গড়া যায় না। লক্ষণীয়, যেহেতু সবত্রুটি সত্ত্বেও সংগঠনটি শ্রমিক সংগঠন ছিল, তাই তাকে তাঁরা আংশিক সমর্থন করেন। ১৮৯০ সালেও, তাঁর ব-ু সোর্জকে লেখা চিঠিতে এঙ্গেলস বলেন,"দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী দলের অস্তিত্ব সম্ভব নয়, যদি না তার অভ্যন্তরের সব রকম মতামত স্পষ্টভাবে জানান দেয়।"

সিপিআই (মাওবাদী) ও তাদের সমালোচকরা

আমরা উপরে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি, তার আলোকে সিপিআই (মাওবাদী)-র সঙ্গে সন্তোষ রাণা ও সংবিত দাসের বিতর্কের বিশ্লেষণ করব।

'শ্রমজীবী' পত্রিকায় 'লালগড় প্রসঙ্গে' শীর্ষক প্রবে- সন্তোষ রাণা সঠিকভাবে জোর দিয়েছেন গণতন্ত্রের প্রাসঙ্গিকতা, এমনকি কেন্দ্রীয় ভূমিকার উপর। কিন্তু সে কোন গণতন্ত্র?

সন্তোষ রাণা যখন লেখেন, "কোনও গ্রামে বা এলাকায় যদি ভিন্ন মতাবলম্বী ৫ জন মানুষও থাকে তাহলেও তাঁদের নিজ নিজ কথা বলতে দিতে হবে এবং তাঁরা কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হলে সেই রাজনৈতিক দলের নীতি-আদর্শ প্রচার করতে দিতে হবে। এটা গণতন্ত্রের মৌলিক শর্ত এবং এটা লংঘিত হলে তা ভিন্ন ধরনের সন্ত্রাসের জন্ম দেয়।" তখন আমরা অবশ্যই তাঁর বক্তব্য সমর্থন করি। রোজা লুক্সেমবুর্গের ভাষায়, বিরোধী মতের স্বাধীনতা থাকলে তবেই তা সাচ্চা স্বাধীনতা।

কিন্তু তার পর কী? সন্তোষ রাণার বিশ্লেষণ থেকে শ্রেণী সংগ্রাম উঠে যাচ্ছে। উঠে যাচ্ছে রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র। তিনি লিখেছেন, "এটা মনে রাখতে হবে যে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত সংস্থা ছাড়া অপর কেউ রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অবস্থান নিতে পারেন না।"

তাই যদি হয়, তাহলে তো একই যুক্তি কেবল পঞ্চায়েত স্তরে নয়, বিধানসভা ও লোকসভা স্তরেও প্রযোজ্য। ঠিক এই কথাই কি আমাদের শেখাননি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, যখন তিনি দাবি করেন, তাঁর দল ভোটে জয়ী, তাই তাঁরা বললে সিঙ্গুরের চাষীকে জমি ছেড়ে দিয়ে নিকটবর্তী কোনো শহরের বস্তীতে বাস করে রিকশা চালাতে বা মুটেগিরি করতে হবে? সিঙ্গুরের চাষী-ক্ষেতমজুর তাঁদের এই অপরূপ গণতন্ত্র মানেননি।

সন্তোষ রাণা এর পর লিখেছেন,"লালগড়ে মানুষের অভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে যে দ্বন্দ্বটি সামনে এসেছে, তা হল আমলাতন্ত্রের সঙ্গে গণতন্ত্রের দ্বন্দ্ব। একমাত্র গণতন্ত্রকে প্রসারিত ও গভীরতর করেই জনগণ আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারেন।"

ঠিক কথা। আমলাতন্ত্র ছাড়া রাষ্ট্র হয় না। রাষ্ট্রের অবলুপ্তি শ্রমিক শ্রেণীর ঐতিহাসিক কর্তব্য। তাই গণতন্ত্রের সম্প্রসারণও আবশ্যক। কিন্তু বুর্জোয়া গণতন্ত্র বিনা বাধায় শ্রমিক গণতন্ত্রে রূপান্তরিত হবে না। পঞ্চায়েতের মাধ্যমেও না। তাই কেবল আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র উক্তিটা অর্ধসত্য, যেমন অর্ধসত্য 'আমলাতন্ত্রের সঙ্গে গণতন্ত্রের দ্বন্দ্ব' কথাটা। লালগড়ে লড়াইয়ের পিছনে রয়েছে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্দেশ্য। স্থায়ীভাবে 'আদিবাসী'দের মধ্যে চরম দারিদ্র জিইয়ে রাখা তাদের লক্ষ্য, কারণ তারই ফলে আসে 'শ্রমের বাড়তি সেনাবাহিনী' (reserve army of labour), যার মাধ্যমে উদ্বৃত্ত মূল্য ও মুনাফার পাহাড় বাড়ে। এই শ্রেণী সংগ্রামের দিকটা না ধরলে, নৈর্ব্যক্তিক, 'গণতন্ত্র' বনাম 'আমলাতন্ত্র'-র গল্পটা শেষ পর্যন্ত যথার্থ ছবি তুলে ধরে না। আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে উৎখাত করার লড়াই শ্রেণী সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

কিন্তু তা হলেও, আমলাতন্ত্র সম্পর্কে সন্তোষ রাণার বক্তব্যের একটা মূল্য রয়েছে, যেমন আছে গণতন্ত্র সম্পর্ক তাঁর বক্তব্যে। গণতন্ত্রের জন্য লড়াইকে কীভাবে বিপ্লবের জন্য লড়াইয়ে রূপান্তরিত করা সম্ভব, এই প্রশ্ন উঠে আসে তাঁর, এবং

অন্য কোনো কোনো রচনা থেকে, যথা 'অনীক' পত্রিকার জুলাই ২০০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত সংবিত দাসের প্রব- থেকে।

এর জবাবে 'পিপলস মার্চ' পত্রিকার অক্টোবর ২০০৯ সংখ্যায় অজয় একটি প্রব- লেখেন, যার শিরোনাম 'লালগড় ও কিছু বিভ্রান্ত বুদ্ধিজীবীর ভ্রান্ত ধারণা।' লেখক জানিয়েছেন, ভ্রান্তি হল, অনীক পত্রিকা এবং শ্রমজীবী (যাতে সন্তোষ রাণার প্রব-টি মুদ্রিত হয়) উভয়েই বলে মাওবাদীরা গণতান্ত্রিক নয়, তাদের গণতন্ত্র সম্পর্কে কোনো বোধ নেই। অজয় প্রথমে একটি কৌশলগত উক্তি করে নিয়েছেন: "আমরা এখানে মাওবাদীদের এমন কোনো ব্যবহারের মদত দিতে আসিনি যা হয়ত অন্যান্য অ-মাওবাদী বা প্রকৃতই প্রগতিশীল শক্তিদের (তাদের যা সীমাবদ্ধতাই থাক না কেন) সঙ্গে আচরণে অগণতান্ত্রিক/ সংকীর্ণতাবাদী। এ সব হয়ত অনিবার্যভাবে থাকে, যদিও যুক্তফ্রন্ট ধাঁচের কাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এ সব এড়ানো উচিত। .... [কিন্তু] যখন এমন কি এটা স্পষ্ট ছিল যে সন্তোষ রাণা বিপজ্জনক, প্রতিবিপ্লবী শক্তিদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে, তখনও [মাওবাদীদের] ভাষা ছিল ব্যাখ্যামূলক, এবং তাকে তারত্রুটি থেকে বেরিয়ে আসতে বলা হয়েছিল।" এরপর অজয় গণতন্ত্রের ব্যাখ্যাতে গেছেন। আমরা সেখানে পরে যাব। প্রথমেই লক্ষণীয়, কীভাবে মাওবাদীদের কার্যকলাপের ব্যাখ্যা এসেছে। বিপ্লবী এবং প্রতিবিপ্লবী শক্তিদের বর্ণনা গোড়া থেকেই শ্রেণীভিত্তিতে নয়, পার্টিভিত্তিতে। শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি শ্রমিক শ্রেণী নিজে আনবে, এমন কোনো মোহে ইনি ভোগেন না। যারা মাওবাদী নয়, তারা বড়জোর সীমাবদ্ধতাসম্পন্ন "প্রগতিশীল"। এই "বিপ্লবী"রা নিজেদের মার্ক্সবাদী বলে দাবি করলেও, তাঁদের কাজ ও চিন্তাপদ্ধতি মার্ক্সের পরিপন্থী। পৃথিবীটা তাই শ্রেণীর ভিত্তিতে ভাগ হল না, হল কে কতটা "প্রগতিশীল", তার এক মানদণ্ডে। সাচ্চা বিপ্লবী অবশ্যই মাওবাদীরা। তাঁরা যদি দশ হয়, তবে কেউ আট, কেউ পাঁচ, কেউ বা পুরো প্রতিবিপ্লবী, অর্থাৎ শূন্য। মাওবাদীদের রাজনীতিকে সমালোচনা করলেই লোকে প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে হাত মেলায়।

এবার আসা যাক অজয়কৃত গণতন্ত্রের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে। রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক, দু'ভাবে তিনি গণতন্ত্র প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। "গণতান্ত্রিক শক্তি মানে সব সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্তবাদ-বিরোধী শক্তি।" আমরা বৃথাই আজকের ভারতে সামন্তবাদ খুঁজব। ইতিহাস ও বর্তমানের এক চূড়ান্ত বিকৃতি ঘটিয়ে ভারতের নিজস্ব পুঁজিবাদী বিকাশকে অস্বীকার করে "সামন্তবাদ" দেখা হয়। সবরকম স্তালিনবাদী ও মাওবাদী রাজনীতির শেষ কথা তো এটাই। আর, তার কারণটাও সুবিদিত। দ্বি-স্তর বিপ্লব মানতেই হবে। প্রথম স্তর হল কোনো না কোনো ধরনের "গণতান্ত্রিক বিপ্লব" ("জাতীয়", "জন" বা "নয়া", যা-ই হোক না কেন)। এইভাবে, গণতন্ত্রের রাজনৈতিক মর্মবস্তুর চূড়ান্ত রূপান্তর ঘটে যায়। মার্ক্সের কাছে, আমরা দেখেছি, গণতন্ত্র দুই প্রকার—বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও শ্রমিক গণতন্ত্র। পেটি বুর্জোয়ারা দু-নৌকায় পা দিয়ে চলতে চায়, কিন্তু তার ফলে তারা গণতন্ত্রের প্রসার চায় না।

এখানেই স্তালিনবাদ এক নতুন 'তত্ত্ব' আনল। এক দিকে তার রাজনীতি মেনশেভিক। বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রগতিশীলদের সঙ্গে মৈত্রী চাই। অন্য দিকে তার রাজনীতি দলসর্বস্ব, স্বৈরতান্ত্রিক। দলীয় কর্তৃত্ব কায়েম করতে হবে। অজয়ের রচনায় এই দুটি ধারণাই আমরা দেখতে পাই। "যে কোনো গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে ঐ সব শক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, কেবল যারা পার্টির দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করছে তাদের নয়"। আহা! কী দয়া। শ্রমিক শ্রেণী তো এই বয়ান থেকে উঠেই গেছে। শ্রেণী সংগ্রামের একমাত্র উল্লেখ হল "সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, সামন্তবাদ বিরোধী শ্রেণী সংগ্রাম।" শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে যে নানা মত থাকতে পারে, এবং থাকলে তা যে প্রকাশ্যে আসবে, তার কোনো স্বীকৃতি নেই- কারণ এই চেতনাই তো নেই। উদ্ধৃত বাক্যটি থে কে বোঝা যাচ্ছে, তথাকথিত গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে কে থাকবে আর কে থাকবে না, তা স্থির করার একক দায়িত্ব স্ব-ঘোষিত অগ্রণী দলের হাতে।

অন্য দিকে, এ থেকেই বোঝা যায়, "সশস্ত্র সংগ্রামের" (অর্থাৎ দলীয় সশস্ত্র বাহিনী দিয়ে মার-কাটারির) উপর কেন এত জোর। "গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট" হল তথাকথিত জাতীয় বুর্জোয়া সহ বহু ধরনের লোকের সঙ্গে ফ্রন্ট। "মূল শত্রুর" বিরুদ্ধে "আধা প্রগতিশীল"দের সঙ্গে ফ্রন্ট। যদি বন্দুক ও অন্যান্য হাতিয়ার না থাকে, তাহলে আর এই জোট, "সংশোধনবাদী"রা যে সব জোট গড়ে, তার সঙ্গে পৃথক কোথায়? তাই বন্দুক ছাড়া চলবে না। "বিপ্লবী" হওয়ার অর্থ বন্দুক ধরা। প্রতিনিয়ত অভ্যুত্থান বা গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীশত্রু হত্যার রাজনীতি সৃজন। তাই দেখা যায়, মাওবাদী রাজনীতির প্রবক্তারা বন্দুক সরিয়ে রাখলে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পাঁকের মধ্যে তাঁরাও ডুবে যান, যেমন দেখা যাচ্ছে নেপালের মাওবাদীদের ক্ষেত্রে।

আবার ফিরে আসি অজয়ের প্রব-। অজয় বলেন, "শ্রেণী সংগ্রাম যত তীব্রতর হয়, তত প্রকৃত গণতন্ত্রীদের সঙ্গে দোদুল্যমানদের মধ্যে পার্থক্যের রেখা তীব্রতর হয়, যার ফলে এ-সব সময়ে অনেক ক্ষেত্রে বহু শক্তি যারা শ্রেণী সংগ্রামের পূর্বতন পর্যায়ে প্রগতিশীল ছিল তারা পরবর্তী পর্যায়ে আন্দোলন ত্যাগ করে।"

এই উক্তির পরে আসে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য যে, বি.জে.এম.এম., বিভিন্ন ঝাড়খন্ডী গোষ্ঠী, ইত্যাদিরা সিপিআই (এম) দলের চর। এখানে ফিরে আসতে হয় সন্তোষ রাণার প্রব-। রাণা লিখেছেন, "গোড়ার দিকে জনগণের কমিটির একটা গণ-চরিত্র ছিল, কিন্তু পরের দিকে তারা পুরোপুরি মাওবাদীদের প্রকাশ্য মুখপত্র পরিণত হয়। ভারত জাকাত মাঝি মাড়োয়ার মত সামাজিক সংগঠনের বিরুদ্ধেও তারা 'গণ আদালতে' বিচার করার লিফলেট বিলি করে এবং সমস্ত রাজনৈতিক বিরোধীদের হত্যা করার

লাইন নেয়। নভেম্বরের অভ্যুত্থানের পর ঐ এলাকায় কোনও হত্যাকান্ড হয়নি। প্রথম হত্যাকান্ড হল সুধীর মান্ডির হত্যা। সুধীর মান্ডি ছিলেন বেলপাহাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি। পাঁচ বছর সভাপতি থাকার পরও তাঁর একটি ছোট মাটির ঘর ছিল যার চালে টালিও ছিল না।"

নির্দিষ্ট অভিযোগের উত্তরে অজয়ের কৌশল লক্ষণীয়। তিনি বলছেন, শ্রেণী সংগ্রাম তীব্রতর হওয়ায় অতীতের প্রগতিশীলরা পরে আন্দোলন ত্যাগ করেছে। যা বলা হল না, কিন্তু আকারে ইঙ্গিতে বোঝানো হল, তা হল, সেরকম লোকেদের হত্যা করা হতেই পারে।

গণ-আদালত ?

আমরা সামান্য কথায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সম্পর্কে মার্ক্সের মত দেখেছি। বুর্জোয়া রাষ্ট্র থাকলে সেই স্বাধীনতা সীমিত, কারণ শেষ পর্যন্ত:

ক) বিচারকদেরও শ্রেণী সম্পর্ক আছে;

খ) যে আইন তাঁরা লাগু করবেন তা একটি শ্রেণীর নির্মিত; এবং

গ) শাসক শ্রেণী প্রয়োজনে বিচার বিভাগেও যথেষ্ট দুর্নীতি আনতে পারে।

কিন্তু তার উত্তরে শ্রমিক শ্রেণী কী করবে? অবশ্যই উন্নত আইন আনতে চাইবে, বিচার বিভাগের অধিকতর স্বাধীনতা চাইবে, এবং তাকে বুর্জোয়া প্রভাবের বাইরে আনবে। কিন্তু "গণ আদালত" কি সেদিকে পদক্ষেপ? হাতে বন্দুকধারী কিছু ব্যক্তি দাঁড়িয়ে। সেখানে "বিচার" হচ্ছে। যে ঐ বন্দুকধারীদের বিরুদ্ধে কথা বলবে, সে যে নিজেও পরদিন "প্রতিক্রিয়াশীলদের চর" বলে চিহ্নিত হবে না, তার প্রমাণ আছে কি? গণ আদালতে বিচারের নাম করে ব্যক্তি হত্যার রাজনীতি তাই ক্ষতিকর। যদি তাতে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বিভেদ আনা হয়, তবে তা হল শোষিত মানুষের মধ্যে কে কোন দলের সমর্থক, তার ভিত্তিতে বিভাজন। এই কাজ স্তালিনীয় প্রতিস্থাপনাবাদ প্রতিনিয়ত করে থাকে। আর যদি উচ্চ শ্রেণীর কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়, তবে তা রাজনৈতিকভাবে ব্যর্থ বলে প্রমাণিত পথ নতুন করে তুলে ধরা। বস্তুত, এ সব কাজে তথাকথিত গণ আদালতকে ব্যবহার করলে বাস্তবে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র যে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চেয়ে উন্নত হবে, এই মার্ক্সবাদী অঙ্গীকারকে মার্ক্সবাদের নামাবলী জড়িয়ে নাকচ করা হয়।

গণতন্ত্র ও সংগঠন

অজয়ের প্রব- এর পরে বলা হয়েছে, শ্রেণী সংগ্রামে শুধু গণতন্ত্র চাই না, চাই শৃংখলা, এজন্য চাই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা বলতে স্তালিনবাদী মাওবাদীরা তো বোঝেন উপর থেকে নির্দেশ। সে বিতর্ক এখন না হয় উহ্য থাক। কিন্তু আদৌ কেন বিপ্লবী আন্দোলনে (দলে নয়) গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা থাকবে? ওটা তো লেনিনবাদী দলের অভ্যন্তরীণ নীতি। গোটা শ্রমিক শ্রেণী তো লেনিনবাদী দল নয়। গোটা শোষিত জনতা তো শ্রমিক শ্রেণী নয়।

যারা এই তথাকথিত গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা মানবে না, তাদের উপর সন্ত্রাস প্রয়োগ, অজয়ের মতে, সন্ত্রাস নয়। ঐ না মানাটা নাকি "বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ ও নৈরাজ্যবাদী আচরণ"। অজয় কথিত নিপীড়িতের গণতন্ত্রের সংজ্ঞা হল, "গণ সংগঠন ও পার্টিতে কমরেডসুলভ পরিবেশ, সাধারণ কর্মী ও নেতৃত্বের মধ্যে গণতান্ত্রিক সম্পর্ক, ইত্যাদি ইত্যাদি।" তিনি বলেন, এ সবের বাইরে [over and above this] যে সব শক্তি শ্রেণী সংগ্রাম সম্পর্কে ইতিবাচক কিন্তু মাওবাদীদের থেকে যাদের মত ভিন্ন, তাদের সঙ্গে ধৈর্য দেখাতে হবে। কিন্তু "অনীক যখন এই কাজটাকে আন্দোলনের কেন্দ্রীয় বিষয় করে তখন তারা বিভ্রান্ত।" অর্থাৎ গণতন্ত্র ততটা দেব, যতক্ষণ আমার নেতৃত্ব অটুট থাকবে। একে গণতন্ত্র বলে না। এ পথে, বিংশ শতাব্দীর স্তালিনবাদী অভিজ্ঞতার পর, আর ভারতের মত দেশে বিপ্লবী আন্দোলন এগোতে পারে না। বরং এই নীতির জন্যই, মাওবাদী রাজনীতি শ্রমিক আন্দোলনে শক্তিশালী হতে পারেনি, সম্ভবত হতে চায়নি। মাওবাদী দল=শ্রমিক শ্রেণীর সাচ্চা বিপ্লবী চেতনা, এই সহজ সমীকরণটা একবার গলাধঃকরণ করতে পারলে তো আর ভাবতে হয় না, শ্রমিকরা আমাদের সঙ্গে কোথায়? যাঁরা নেই, তাঁরা হয় "বিভ্রান্ত", নয় "বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী" অথবা এমনকি "প্রতিবিপ্লবীদের চর"। যে শ্রমিকরা সিটু করেন, তাঁদের কথা তো বলারই দরকার নেই। পূর্ণ গণতন্ত্র ছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠের সচেতন বিপ্লবী লড়াই অসম্ভব, মার্ক্স-এঙ্গেলসের এই উপলব্ধি থেকে অজয় ও সন্তোষ রাণা দুজনেই তাই বহু দূরে। অজয়ের চোখে "গণতন্ত্র" হল কিছু সংগঠনের জোট। সন্তোষ রাণার চোখে আমলাতন্ত্র বনাম গণতন্ত্র, এটাই মূল লড়াই।

বিকৃত "গণতান্ত্রিক" চেতনা

বর্তমান প্রব- শেষ করব একটি প্রসঙ্গ তুলে। সিপিআই (মাওবাদী) দলের "গণতান্ত্রিক" জোটের রাজনীতি কতটা বিকৃত, তা বোঝা আবশ্যক। সামান্য দুয়েকটি নজির তুলে ধরব। এগুলি পরবর্তী বিভিন্ন প্রব- বিশদ আলোচনা করা দরকার। অজয়ের মতে, সিপিআই (এম) দল হল "সামাজিক ফ্যাসীবাদী"। এই বস্তাপচা স্তালিনবাদী তত্ত্ব অতীতে খাঁটি ফ্যাসীবাদকে ক্ষমতায় আসতে সাহায্য করেছে। আজ কেন তাকে ফের ঝেড়েঝুড়ে বার করা হয়েছে তাও স্পষ্ট। পরে অস্বীকার করলেও, এক

অসর্তক মূহূর্তে মাওবাদী নেতা কোটেশ্বর রাও ওরফে কিষেণজী বলে ফেলেছেন, তাঁরা চান, পশ্চিমবঙ্গে আগামী নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জয়ী হোন। এই উক্তি অস্বাভাবিক নয়। ১৯৩১ সালে জার্মানীতে প্রাশিয়ার প্রাদেশিক সরকারকে ফেলার জন্য উগ্র দক্ষিণপন্থী দলগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল স্তালিন নির্দেশিত জার্মানীর কমিউনিস্ট দল। সে বিষয়ে আমরা পরে স্বতন্ত্র আলোচনা করব। কিন্তু সিপিআই (মাওবাদী) দলের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আরো জটিল। এই দল মুখে দাবি করে, তারা বয়কটপন্থী। অথচ কার্যত তারা ভোটযুদ্ধে একটা পক্ষ নিতে চায়।

আমরা মনে করি, সিপিআই (এম) যেভাবে পশ্চিমবঙ্গ পরিচালনা করেছে, তা "একদেশে সমাজতন্ত্র" এবং দ্বি-স্তর বিপ্লব তত্ত্বের অনিবার্য পরিণতি। কিন্তু পচনশীল স্তালিনবাদকে হঠানোর রাস্তা জাঙ্গী শ্রমিক আন্দোলন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে হাত মেলানো নয়, তার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল "সামাজিক ফ্যাসীবাদ" তত্ত্বকে পুনরুজ্জীবিত করাও নয়।

"গণতান্ত্রিক" শব্দটির মাওবাদী বিকৃতিরই আরেকটি ফল হল, মার্কিন বিরোধী যে কোনো শক্তিকে গণতান্ত্রিক আখ্যা দেওয়া, ভারতীয় রাষ্ট্র বিরোধী যে কোনো শক্তিকে প্রগতিশীল মনে করা। তাই কোটেশ্বর রাও গত ৯ জুনের হিন্দুস্তান টাইমসকে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানের ইসলামিক জিহাদিদের সমর্থন করে বলেন, "এটি মূলগত-ভাবে মার্কিন বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী"। এটি মূলগত ভাবে অসত্য। মার্কিন বিরোধিতা ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা সমার্থক নয়। ইসলামিক জিহাদিদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের মার্ক্সবাদীরা লড়াই করছেন। তালিবান, আল কায়দা, লস্কর-এ-তৈবা প্রভৃতি শক্তি বারে বারে ঘোষণা করেছে, তাদের লক্ষ্য ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা, যেখানে না থাকবে গণতন্ত্র, না নারীর অধিকার, ইত্যাদি। এদের আন্দোলনের শ্রেণী চরিত্র বিশ্লেষণ না করে, এরা যে অতীতে সি.আই.এ-র মদতে তৈরি সে কথা না ভেবে, এদের সমর্থন করা দেখিয়ে দেয়, "গণতন্ত্র" কথাটা কতটা অর্থহীন। ঠিক একইভাবে, কোটেশ্বর রাও আরেকটি সাক্ষাৎকারে আলফাকে সমর্থন জানিয়ে বলেছেন, তাঁর সংগঠন আলফা সহ বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে চুক্তি করেছে। আলফা একটি জাত্যাভিমানী সংগঠন। এরা অসমীয়া নয়, এমন ভারতীয় নাগরিকদের (শ্রমজীবীদের) আক্রমণ করে। আসামের যে সব গণতন্ত্রী এদের মতাদর্শের সমালোচক তাঁদেরও আক্রমণ করে। তাদের সঙ্গে আঁতাত গণতান্ত্রিক? সিপিআই (মাওবাদী) ও তার সমর্থকরা নিজেদের মার্ক্সবাদী মনে করলে তাঁদের এ নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে।